



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.83-90

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

পুরুষতন্ত্র : একটি মতবাদিক নির্মাণ ও তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সীমাবদ্ধতা

ড: অমিতাভ কাজিলাল

বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শিলিগুড়ি কলেজ, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

From theoretical perspectives, Patriarchy has been designated as a mode of domination. As a consequence the counter-currents to refute such a position have been much critical to the various attributes of Patriarchy and have often portrayed it in a negative fashion. Feminism, also, while criticising Patriarchy as aggressive, anti-equality, intolerant and unjust fail to signify why, instead of being such degressive in nature, Patriarchy has survived through generations, as human intellect has evolved through the age of reason and modernity. Certainly then, Patriarchy is not a static or rigid idea and has surely gone through reformation and rectifications with the changing face of time. If any political proposition, like Feminism, misses to note such evolutionary dimensions within Patriarchy, a serious gap emerges in the understanding of the basic premise of the feminist theorization. The present paper is aimed at tracking genuine lacking in measuring the shortfall of patriarchal notions and Patriarchy itself, for that matter and to highlight the evolutionary dynamics within Patriarchy.

Key Words: Patriarchy; Feminism; Domestic Labour; Anarchy; Attained Excellence; Parallel Sexuality

‘পুরুষতন্ত্র’-এর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য: সমাজ শাস্ত্রে ‘পুরুষতন্ত্র’ কথাটির যে বিবিধ ব্যাখ্যা এবং অমীমাংসিত বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষ্য করা যায়, তাদের সমন্বিত করলে সাধারণ যে ধারণাটি গড়ে ওঠে তদনুযায়ী ‘পুরুষতন্ত্র’ হচ্ছে এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতার প্রাথমিক দখল পুরুষদের করায়ত্ত এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ধর্মীয় তথা নৈতিক কর্তৃত্ব, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও সম্পত্তির বন্টন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সকল সূত্রেই পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব প্রাধান্য বিস্তার করে। পারিবারিক পরিসরেও প্রধান অর্থাৎ ‘কর্তা’ পদটি পুরুষের জন্যই ঐতিহ্যগতভাবে সংরক্ষিত থাকে। এইভাবে কিছু কিছু সমাজে পিতৃগোত্র অনুসারী পরিবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় যেখানে সম্পত্তি ও পদবী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পুরুষানুক্রমিক পরিচয়ের ভিত্তিতে অধিকৃত হয়। সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয়তা নির্বিশেষে ঐতিহাসিকভাবেই বিস্তৃত পরিসরে সামাজিক, আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পুরুষতন্ত্রের উপস্থিতি এবং প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থা ও আইনি বন্দোবস্ত পুরুষতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হবার কথা নয়, তথাপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আইনি বোঝাপড়া সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতি’কে অনুসরণ করে গড়ে উঠতে গিয়ে পুরুষতান্ত্রিকতাকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পারেনা।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ‘পুরুষতন্ত্র’ বা Patriarchy কথাটির উদ্ভব দু’টি গ্রিক শব্দের সম্মিলনে। ‘প্যাটার’ - যার অর্থ পিতা এবং তজ্জনিত বংশ এবং ‘আর্কো’ - অর্থাৎ আমি শাসন করি। অতএব ‘প্যাট্রিয়ার্ক’ কথাটির আদি গ্রিক শব্দ ‘প্যাট্রিয়ার্কেস’ কথাটির আক্ষরিক অর্থ ছিল ‘পিতার শাসন’। ‘প্যাট্রিয়ার্কি’ কথাটির দ্বারা পরবর্তীতে নারীবাদী বিশ্লেষণে ‘পুরুষের স্বৈরাচারী প্রাধান্য’কেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমাজশাস্ত্রের পরিসরে ‘পুরুষতন্ত্র’ কথাটির মাধ্যমে কেবল ‘পুরুষের প্রাধান্য’ই নয়, ‘পুরুষকেন্দ্রিকতা’কেও বোঝায়।

নারীবাদ ও ‘পুরুষতন্ত্র’: নারীবাদ তার বৌদ্ধিক ভিত্তি’টি স্থাপন করেছে ‘পুরুষতন্ত্র’ নামক একটি আধিপত্যবাদী সামাজিক ধারণা তথা বিদ্যমান ব্যবস্থা’কে তীব্র সমালোচনা করে - এ কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু পুরুষতন্ত্র কি ও কেন? পুরুষতন্ত্র কি আপেক্ষিক? অর্থাৎ নারীতন্ত্র নামক অপর কোন ধারণা অথবা ব্যবস্থার তুলনায় অধিক আধিপত্যবাদী? না কি স্বতঃসিদ্ধ? অর্থাৎ যে যেমনভাবে একে গ্রহণ, ব্যাখ্যা-বিবেচনা বা (ধারণারূপে) প্রয়োগ করবেন এটি সেভাবেই বিনা বিতর্কে প্রবর্তিত হতে পারে? পুরুষতন্ত্র কি একটি সময়ভিত্তিক ধারণা? অর্থাৎ ঐতিহাসিক? তাহলে তো তার সময়ানুবর্তি বিবর্তিত স্বরূপ থাকবার কথা! না কি এটি একটি ধ্রুপদ - তা নিয়ে সুগঠিত ও সর্বজনগ্রাহ্য চিন্তাসূত্রের ঘাটতি অস্বীকার করা যায় না।

নারীবাদ পুরুষতন্ত্র’কে মূলত দুটি উপায়ে বিশ্লেষণ করেছে। প্রথমত, ‘অর্জিত আচরণ হিসেবে পুরুষতন্ত্র’ অর্থাৎ লিঙ্গবৈষম্য ভিত্তিক সামাজিকীকরণের ফলস্বরূপ এক ধরনের অপ্রাকৃতিক আচরণের চর্চা; এবং দ্বিতীয়ত, ‘প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরুষতন্ত্র’ অর্থাৎ একটি আধিপত্যমূলক ব্যবস্থাপনা - যা পরিবার, সমাজ, নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্র - সর্বত্র বিদ্যমান।’ কিন্তু নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পুরুষতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণার উৎস অনুসন্ধান গলে দেখা যাবে, নারীবাদের চিন্তাধৃত পুরুষতন্ত্রের ধারণা কাঠামোটি নেওয়া হয়েছে ধর্মীয় বিধি-বিধানের সূত্রসমূহ থেকে। বেদ-বাইবেল-হাদিসের পৌরুষেয় নীতি ও ন্যায়কেই সমাজ-সাংস্কৃতির মূলস্রোতের মুখ্য নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করতে গিয়ে নারীবাদ কিন্তু অধর্মীয় সমাজ বা নাস্তিকদের সমাজে কোন পুরুষতন্ত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আদৌ সম্ভব কি না সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বীক্ষণের দৈন্যে বিদীর্ণ হয়েছে।

আসলে পুরুষতন্ত্রকে নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস নিলে যে সমস্যাটা অবশ্যম্ভাবী, তা হল যুক্তি আর আবেগের অনিয়মিত ভারসাম্যের সমস্যা। এর থেকে দ্বিবিধ অসুবিধার উৎপত্তি হয় - প্রথমত, অভিজ্ঞতাবাদী তাত্ত্বিকরা এমন আবেগসিক্ত বিশ্লেষণে আমল দেবেন না, ফলে পুরুষতন্ত্র’কে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া বা বণ্টন প্রণালীতে প্রভাব বিস্তারকারী ‘গোষ্ঠীর আচরণগত’ প্রশ্ন হিসেবে বিচার করার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে আর দ্বিতীয় অসুবিধা’টি আরও বিচিত্র। যে কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণেই হোক, যেহেতু ‘পুরুষতন্ত্রবাদ’ বলে কোন তাত্ত্বিক বা দার্শনিক চিন্তাকাঠামোর অস্তিত্বই নেই তাই পুরুষতন্ত্রের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও প্রকৃতি, সবটাই পুরুষতন্ত্র বিরোধীতাকারি একটি মতবাদের অনুমান থেকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের স্বঘোষিত কোন পরিচয় নেই কিংবা নিদেনপক্ষে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ কোন মতবাদ থেকে পুরুষতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে পুরুষতন্ত্র সম্পর্কে এ যাবত প্রচলিত ও প্রচারিত সকল ধারণা ‘অন্ধের হস্তিদর্শন’-এর সামিল মনে হতেই পারে।

সামাজিক চুক্তি ও ‘পুরুষতন্ত্র’: পুরুষতন্ত্রকে ক্ষমতার এক ধরনের অসামান্য বিন্যাস হিসেবে দেখার প্রয়াস নিয়েছে নারীবাদ। সেক্ষেত্রে সামাজিক শ্রমবিভাজনের লৈঙ্গিক অভিসন্ধিকে নারীবাদীরা সমালোচনা করেছেন। পুরুষ ও নারীর সামাজিক শ্রম যথাক্রমে আনুষ্ঠানিক শ্রম ও অনানুষ্ঠানিক শ্রম অথবা মূল্যসম্পৃক্ত

শ্রম ও মূল্যবিশিষ্ট শ্রম হিসেবে ধার্য হওয়ার মাধ্যমে মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রের দিকে ক্ষমতা কেন্দ্রের প্রতিসরণ ঘটেছে বলে নারীবাদীরা দেখাতে চান। তাঁদের অনুমান-প্রকল্পকে তাঁরা ঐতিহাসিক সত্য বলে ব্যাখ্যা দিতে চান।^১ নারীবাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গিরও সীমাবদ্ধতা আছে। যদি তর্কের খাতিরেও ধরে নেওয়া যায় যে প্রাক-সামাজিক ‘প্রকৃতির রাজ্য’ ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং উদ্ভূত পৌর সমাজ বা তার পরবর্তীতে রাষ্ট্রব্যবস্থা হয়ে উঠল পুরুষতান্ত্রিক, তাহলেও প্রশ্ন চলেই আসবে যে মধ্যবর্তী ‘সামাজিক চুক্তি’র পর্বে অংশগ্রহণকারী মাতৃকুল ও পিতৃকুল কি নিজেদের পক্ষে সামাজিক শ্রমবিভাজনের সর্বাধিক সুবিধা অর্জনের প্রচেষ্টায় বা দর কষাকষিতে পূর্বপ্রচলিত মাতৃতন্ত্রের প্রভাবে আধিপত্যের বিচারে মাতৃকুলের প্রতিই সবিশেষ পক্ষপাতদৃষ্টি ছিলেন না? তাহলে এই তথাকথিত শ্রমের সামাজিক বৈষম্য কাদের নির্মাণ? আরও সহজ করে বলতে গেলে, হয়তো পরিবারের বাইরে শ্রম দিতে যাবার ব্যবহারিক ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত হয়েই মাতৃকুল সেদিন বেছে নিয়েছিলেন ‘গার্হস্থ্য শ্রম’-এর পরিসর। আর যে কোন আধিপত্যের মতোই পরশ্রমভোগী হবার প্রয়াসে পিতৃকুলের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন অধিক ঝুঁকিসম্পন্ন আনুষ্ঠানিক শ্রম - যেমন - উৎপাদন, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি। কিন্তু তা করতে গিয়ে আধিপত্যের বিন্যাসে পরিবর্তনের সূচনা তাঁরাই করেছিলেন। কারণ শ্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে প্রযুক্তি ব্যবহারের ধারণা। বলাই বাহুল্য, আনুষ্ঠানিক শ্রমের আনুষঙ্গিক প্রযুক্তির বিকাশ যে গতিতে ঘটে, অনানুষ্ঠানিক শ্রমের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক প্রযুক্তির বিকাশ হয় তার চেয়ে তুলনামূলকভাবে মন্থর লয়ে। আর তাছাড়া আনুষ্ঠানিক শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত প্রযুক্তির চরিত্র মৌলিক। সেই মৌলিক প্রযুক্তিকে নির্ভর করে বা তার উপজাত হিসেবে গড়ে ওঠে মাধ্যমিক প্রযুক্তি যা গৃহপালন শ্রমের সহায়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আনুষ্ঠানিক শ্রম দিতে গিয়েই পিতৃকুল এই দ্রুত বিকাশমান এবং মৌলিক চরিত্রসম্পন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার ও তৎসম্পর্কিত জ্ঞান আত্তীকরণের সুযোগ সবার আগে পেয়েছেন। ফলে তাঁদের উৎপাদক-আচরণসহ বিভিন্ন সামাজিক আচরণে সংস্কার সাধন ঘটেছে প্রযুক্তির উপযোগিতার মাধ্যমে। সেই সংস্কারের উপায়ে তাঁরা আধিপত্যের নতুন কাঠামো তৈরি করতে পেরেছেন। যোগাযোগের জন্য সৃষ্টি করেছেন নতুনতর ভাষাপদ্ধতি, যা থেকে মাতৃকুলের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পরিসর ক্রমাগত বিয়োজিত হতে থাকে এবং সেই ভাষাপদ্ধতিকে ক্রমাগত করে তুলেছে পুরুষালি। অনুরূপ, ক্ষমতাকেও তাঁরা একরকম প্রযুক্তি হিসেবেই গণ্য ও ব্যবহার করেছেন। স্বার্থ আদায় এবং তৎকেন্দ্রিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রযুক্তি হিসেবে ক্ষমতা’কে ব্যবহার ও রপ্ত করেছেন।^২ এইভাবে ধাপে ধাপে পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাতৃতন্ত্র’কে আধিপত্যচূত করেছে।

সামাজিক বিবর্তন ও ‘পুরুষতন্ত্র’: শুধু সামাজিক চুক্তি মতবাদিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বিবর্তনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও পুরুষতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য অর্জনের একটি ভিন্নতর প্রেক্ষিতকে অনুধাবন করা যায়। প্রাকৃতিক-সমাজে মাতৃতন্ত্র ছিল একটি অনুকূল মানবসমাজ-বাস্তবীতি। এই সামাজিক-বাস্তবীতির কেন্দ্রীয় মূল্যবোধটি ছিল অভিযোজন এবং মানিয়ে চলা। কারণ মানবিক জীবনযাত্রার অধিকাংশই ছিল প্রকৃতি-নির্ভর।^৩ প্রকৃতি থেকেই সংস্থান ও স্থান সংগ্রহ করে সামাজিক জীবন গড়ে উঠতো। তাই প্রকৃতির বা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করে বিকল্প মানবিক জীবনধারা সৃষ্টি এবং প্রয়োগের কথা মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি ভেবে উঠতে পারেনি বা চায়নি। সংরক্ষণ, সঞ্চয়, সীমিত ভোগ, পুনর্ব্যবহার, পুণঃসঞ্চয় ইত্যাদি মূল্যবোধকে ব্যক্তিগতস্তর থেকে সামাজিকক্ষেত্র পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হতো। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক বাস্তবতন্ত্রের অপরাপর সহযোগী প্রজাতিকুলের প্রতি সহমর্মিতায় গার্হস্থ্য বৈশিষ্ট্য আরোপ করে তাদের গৃহপালনের ব্যবস্থাদি করা হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন হতে শুরু করে।

প্রযুক্তির বিবর্তনের হাত ধরে প্রকৃতিবান্ধব জীবনযাত্রার পরিবর্তে পরিবেশভিত্তিক জীবনশৈলী অধিক গুরুত্ব পেতে থাকে, যার কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ হয়ে উঠেছিল আগ্রাসন ও সংস্কার। প্রকৃতিকে ছেঁটে-কেটে কেবলমাত্র মানব-স্বার্থের উপযোগী করে তোলা। উৎপাদনযোগ্য ও বসতযোগ্য জমি আদায়ের জন্য অরণ্য ধ্বংস করা হয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে খুব বেশি বিচলিত না হয়েই, প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের সংরক্ষণের পরিবর্তে তাকে অধিকাধিক ভোগ্য হিসেবে ব্যবহার-উপযোগী করে তোলার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সঞ্চয়ের পরিবর্তে তাৎক্ষণিক সুখের জন্য যত বেশি সম্ভব বহুমুখী ব্যবহার আদায়ের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য প্রজাতির প্রতি নির্মম আচরণের মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক আধিপত্য কায়ম করা হয়েছে এবং এইভাবে প্রকৃতিবান্ধবতা পরিত্যাগ করে পরিবেশ-ভিত্তিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছে মানবসমাজ। এইভাবে ‘প্রকৃতি’ থেকে মনুষ্য-স্বার্থ-প্রাধান্য-ভিত্তিক বসবাস ব্যবস্থা হিসেবে ‘পরিবেশ’-এর উদ্বর্তন মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিসর্জন ও পুরুষতান্ত্রিকতার উত্থানকে সুনিশ্চিত করেছিল সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই।

এইভাবে দেখা যায় “পুরুষতন্ত্র”-এর উদ্ভব বিষয়ে নারীবাদীরা যা বুঝিয়ে এসেছেন, তা আসলে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক নির্মাণ, যা ব্যতিরেকে নারীবাদের মৌল যুক্তিকাঠামোটিই অগ্রাহ্য হয়ে যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে আগেই বলে নেওয়া ভালো যে মাতৃতন্ত্রের উদ্ভবের কিন্তু কোন ঐতিহাসিক ব্যবহারিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা উল্লেখ করছে, The view of matriarchy as constituting a stage of cultural development is now generally discredited. Furthermore, the consensus among modern anthropologists and sociologists is that a strictly matriarchal society never existed. একই সাথে আরও একধাপ এগিয়ে মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রকে ঘোষণা করছে “hypothetical social system” হিসেবে। তবে এই অনুমিত সমাজ ব্যবস্থাগুলির বিকাশ, সাংস্কৃতিক বিন্যাস ও প্রভাব এত ব্যাপক যে, এদের এক ধরনের মহা-পরিব্যখ্যা বা meta-narrative বললে বোধহয় অতুক্তি হয় না। অন্ততঃ এ বিষয়ে নারীবাদীরাও মনে হয় দ্বিমত করবেন না। পুরুষতন্ত্রের ‘স্বভাব’ ও ‘অভাব’ (অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা) সম্পর্কে আর যেসব চিন্তাসূত্র পাওয়া সম্ভব তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল, আন্তর্জালে তথ্যের মহাসড়কে ‘পুরুষতন্ত্র’ সম্পর্কে প্রায় ২৮,৭০,০০০ সংখ্যক তথ্যসূত্র রাখা আছে। এই বিপুলসংখ্যক সূত্রগুলিকে এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মোটামুটি চারটি ভাগে বিভাজিত করা যেতে পারে, - প্রথমত, আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণমূলক সূত্র; দ্বিতীয়ত, বিবিধ সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক বীক্ষণে ইতস্তত উল্লেখিত পুরুষতন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনার সংগ্রহমূলক সূত্র; তৃতীয়ত, পুরুষতন্ত্রের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে জনমতগঠনমূলক সূত্র এবং চতুর্থত, পুরুষতন্ত্রের পরিচয়ে সমান্তরাল যৌনতাকে বৈধতা প্রদানের সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা বিষয়ক সূত্র। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, প্রতিটি ধরনের সূত্রেই পুরুষতন্ত্রকে ‘বিদ্যমান আধিপত্য’ বলে বিবেচনা করা হলেও, তথা বিভিন্ন সামাজিক পর্যায়ে পুরুষতন্ত্রের বিভিন্ন প্রেক্ষিত’কে চিহ্নিত করার চেষ্টা হলেও একে কিন্তু কোন ‘ইতিহাস নির্দিষ্ট অবস্থান’ বলে বিবেচনা করা হয়নি, অথচ ব্যবহারিক পরিচয়ে পুরুষতন্ত্রের রক্ষণশীল চরিত্রের জন্য তাকে তুমুল সমালোচনা করা হয়েছে।^৬

জৈববিবর্তনবাদ ও ‘পুরুষতন্ত্র’: Steven Goldberg ১৯৭৩ সালে যখন পুরুষতন্ত্র প্রসঙ্গে তাঁর বহু-বিতর্কিত মতামত The Inevitability of Patriarchy: Why the Biological Difference between Men and Women always Produces Male Domination শীর্ষক বইতে প্রকাশ করলেন তখন নারীবাদের দ্বিতীয়

প্রভাবশালী মেধা-তরঙ্গ সকল ধরনের সমাজশাস্ত্রীয় আলোচনার পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর দিকে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। গোল্ডবার্গ লিখলেন, শারীরবৃত্তীয় রসায়নের গুণগত পরীক্ষায় দেখা যায় টেস্টোস্টেরন (পুরুষত্ব নির্ধারক হরমোন) ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্ট্রনের (নারীত্ব নির্ধারক হরমোন) তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট তথা তৎপর উদ্দীপক। তাই জৈববৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দ্বারাই পুরুষতন্ত্র একটি ‘স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নির্মাণ’। অবশ্যই তাঁর এই মতবাদ সমসাময়িককালে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও পরবর্তীতে জীববিদ্যার গবেষণায় তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এর ফলে পুরুষতন্ত্র সম্পর্কিত জৈব-বিবর্তনবাদী যুক্তিপ্রবাহ ও মতবাদ কিছুটা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে এই আলোচনায় ইতিপূর্বে সামাজিক শ্রমবিভাজনের উপায়ে পুরুষতন্ত্রকে একটি আধিপত্য-যুগান্তকারী পরিস্থিতি বলে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদী দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে এই নয়া আধিপত্যবাদ (মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্র) কিভাবে ঐতিহ্য হয়ে উঠল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জৈব-বিবর্তনবাদের কুশলী চিন্তানায়ক ল্যামার্কের ‘অব্যবহারে অবলুপ্তি বা বহু-ব্যবহারে অর্জিত ঔৎকর্ষ’-এর ধারণার অবতারণা আছে।^৬ একই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে প্রাক-পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে মাতৃতন্ত্র একটি বহু-ব্যবহারে উদ্ভর্তিত প্রণালী হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল হয়তো।

পুরুষতন্ত্রের প্রায়োগিক অনুমানগুলি সম্পর্কে কয়েকটি ব্যবহারিক প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে যে, পুরুষতন্ত্র কি বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রদর্শিত আচরণ বা বিবেচনার একটি বর্ণনাম? পৃথিবীতে যদি মহিলারা না-থাকেন তবে কি ‘পুরুষতন্ত্র’ বলেও কিছু থাকবে না? অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের অবস্থিতি কি আপেক্ষিক? নাকি পুরুষতন্ত্র একধরনের লিঙ্গ-মূল্য-নিরপেক্ষ ক্ষমতাবিন্যাস, আর তাই যে কোন তন্ত্রের মতোই ‘সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রকাশ করে’? তাহলে পুরুষতন্ত্রের উপতন্ত্রগুলিও একইধরনের ‘সার্বজনীন বৈষম্য’ সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে মীমাংসকের (Arbitrator) ভূমিকা কে নেবে? আর যদি মীমাংসক না-পাওয়া যায়, তাহলে লৈঙ্গিক ন্যায়ের বা Gender Justice’এর প্রশ্নে যা পাওয়া যেতে পারে তা হলো এক ধরনের লৈঙ্গিক সমঝোতা বা Gender Mutual Understanding! তাকে বৈধতা দিতে গেলে কিন্তু পক্ষান্তরে বিকল্প অভিমত’টির অবদমনকেও বৈধতা দেওয়া হয়।

মার্ক্সবাদ ও ‘পুরুষতন্ত্র’: মার্ক্সবাদীরা মনে করেন পুরুষতন্ত্র আসলে একটি কৃত্রিম নির্মাণ। তাঁদের শ্রেণীভিত্তিক সমাজবীক্ষণে পুরুষতন্ত্র কোন রীতিসিদ্ধ আধিপত্যকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁরা মনে করেন, শোষিত শ্রেণীর প্রতিকূলে শোষকের এই ‘কল্প’ নির্মাণ আসলে শোষিতের রাজনৈতিক সংহতির বিপক্ষে একটি কৌশলগত প্রচার। অবশ্য এঙ্গেলস্ তাঁর ‘পরিবার’ সংক্রান্ত মতামতে এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, শ্রেণীবৈষম্যমূলক প্রতিটি সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলিও শ্রেণী-শোষণরীতির উর্ধ্বে উঠতে পারে না। সে ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলা সদস্যটি ‘পরিশ্রমজীবী’ আর পুরুষ সদস্যটি ‘পরশ্রমজীবী’র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এজন্য পুরুষতন্ত্রকে শ্রেণী-শোষণের সাথে সামঞ্জস্যশীল Agent-Structure সম্পর্কের আওতায় মার্ক্সবাদীরা দেখেন না।^৭ যদিও পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ পুরুষতন্ত্র’কে সামন্তবাদের উপজাত ব্যবস্থা বলেই আলোচনা করেছে যা পুঁজিবাদেও উপনীত হয়ে মহিলাদের ‘শ্রমজীবী প্রজন্ম সরবরাহের যন্ত্র’ হিসেবে বিবেচনা করে। পুঁজিবাদের ব্যাপক প্রকৃতি-গ্রাসী ও সর্বাঙ্গিক ভোগবাদী চরিত্র’কে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা ‘পুরুষালি’ বৈশিষ্ট্যরূপেই চিহ্নিত করেন।

সামাজিক সম্পর্ক ও ‘পুরুষতন্ত্র’: পুরুষতন্ত্রকে যদি ‘প্রভাবক-প্রভাব-প্রভাবিত’ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যায়, পুরুষতন্ত্র তার সার্থক রূপে প্রকাশিত হয় ব্যক্তিপুরুষ ও ব্যক্তিনারীর আন্তঃসম্পর্কের আচরণ বিন্যাসের মধ্যে পুরুষের দ্বারা সুবিধাজনক পরিস্থিতির অধিকাংশ আত্মসাৎ করার প্রবণতার মাধ্যমে। এই প্রবণতা যেনতেনপ্রকারেণ আরোপিত হয়, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য হয় যে পর্যন্ত সুবিধা-বঞ্চিতদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সংস্থান প্রাপ্তিটাই তাদের কাছে পরম সৌভাগ্য বলে বিবেচিত না হয়! কিন্তু একইধরণের আচরণকে যখন ব্যক্তি ও সমূহের বা গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দেখা হয় তখন তাকে আর ‘পুরুষতন্ত্র’ বলে চিহ্নিত করা হয় না, তা তখন ‘স্বৈরতন্ত্র’ হিসেবে পরিগণিত হয়। অথচ পুরুষতন্ত্র ‘স্বৈর’ নয়, কারণ তাঁর ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাতে ‘যথেষ্টচারিতা’ নয় বরং ‘প্রথানুগত্য’ প্রধান বিবেচ্য। পুরুষতন্ত্রের আপাতনিরীহ প্রদর্শমূলক প্রকাশটি হল ‘উপাধিপ্রথা’ অর্থাৎ আমরা আমাদের পিতৃবংশের উপাধি নিজস্ব নামের সাথে বহন করি বা বিবাহের পর একজন মহিলাকে তাঁর পিতৃবংশের উপাধি-পরিচয় বিসর্জন দিতে হয়। অবশ্য এটি কোন সার্বজনীন সত্য নয়, জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির বিভিন্নতায় এ নিয়মের ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। তবে সমধিক প্রচলিত এই পিতৃবংশের উপাধি-পরিচয়ের অগ্রগণ্যতার প্রথাটি অনৈতিক বলেই দাবী করেন নারীবাদীরা। যদিও তার কোন যুতসই নৈতিক বিকল্প কী হতে পারে, তার কোন প্রস্তাবনা নেই তাঁদের পক্ষ থেকে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, সর্বণ বা সমগোত্রীয় বিবাহপ্রথায় এমন অভিযোগের বহর কি নিতান্তই পোশাকি অভিযোগ বলে গণ্য হবে না? যখন অসর্বণ বা অসমগোত্রীয় বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের বংশ পরিচয়ের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রাধিকার পায় জাত-নুকুল-গোষ্ঠী ইত্যাদি বিশেষিকৃত পরিচয়ের দিকটি। স্বজাতের নির্দিষ্ট ‘বেরাদরী’র বাইরে বিবাহ সেখানে সামাজিক তিরস্কারের, এমন কি ‘মর্যাদা-হত্যা’র মতো নৃশংসতার শিকার হতে হয় পুরুষ, নারী - উভয়কেই!

মজার বিষয় হল এইসব পরিচয়ের পরিসর পৌরসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র কিন্তু আমাদের চিনে রেখেছে নথিভুক্ত কতগুলি সংখ্যার স্বরূপে অথবা বারকোডের মাধ্যমে - ভোটারকার্ড, রেশন কার্ড, প্যানকার্ড, পাসপোর্ট, সিটিজেন কার্ড ইত্যাদিতে যা দ্রষ্টব্য। তাহলে এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘রক্তকরবী’ নাটককে অনুসরণ করে বলা যায় - ‘ন’ পাড়ার ২১২ নম্বর লোক, কিম্বা ‘ৎ’ পাড়ার ৭৮৫ নম্বর মানুষটি বলেই আমাদের পরিচয় কিংবা আমাদের উপযোগিতা ভিত্তিক পরিচয়, যেমন - ৪৯৩ নম্বর অধ্যাপক বা ৭৮৬ নম্বর কুলি ইত্যাদি পরিচয়গুলি কি যথার্থ নীতিসঙ্গত হবে? আদতে প্রভাবক-প্রভাব-প্রভাবিত তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি একত্ববাদী সমাজ-সংস্কৃতিতে পুরুষতন্ত্র একরৈখিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলেই প্রতিভাত হয়, পক্ষান্তরে একটি বহুত্ববাদী সমাজ-সংস্কৃতিতে পুরুষতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং তার নির্মাণ সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বহুত্ববাদী সমাজ-সংস্কৃতির প্রসারের জন্য পুঁজিবাদের বিকাশ, বাজারব্যবস্থার সম্প্রসারণ, উপভোক্তা মানসিকতার সংস্কার, শিক্ষার প্রসার, গণতান্ত্রিক অধিকারের সহজলভ্যতা, ন্যায়বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।^৮ উদারনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমসম্প্রসারণ পুরুষতন্ত্রের আদি মৌলবাদী রূপটির পরিবর্তন করে তাকে অনেক বেশি সহনশীল, উদার, লৈঙ্গিক ন্যায়বিচারের দ্বারা পরিচালিত একটি বন্টন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বলে দাবী করা হয়।

যৌনস্বাতন্ত্র্য ও ‘পুরুষতন্ত্র’: পুরুষতন্ত্রকে প্রসারিত করলে আমরা কি ‘সমকামীতা’র পরিসরে উপনীত হব? সমান্তরাল যৌনবাদকে ‘আদর্শ’ হিসেবে প্রতিস্থাপিত হতে দেখব? পুরুষতন্ত্রকে সমর্থনযোগ্য বা নিন্দনীয়

যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন তার বিপক্ষে শীর্ষ বিবেচনাটি একসময় 'বিবাহ' বা 'বিপরীত লিঙ্গের সহবাসকে' অবদমনমূলক তাই বর্জনীয় বলে গণ্য করবে। একে 'লৈঙ্গিক স্বার্থপরতা' না কি 'লৈঙ্গিক স্বাতন্ত্র্য', কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা উচিত আপাতত সে প্রশ্ন সরিয়ে রেখে আলোচনা করা যেতে পারে এসবের ফলে পুরুষতন্ত্রের কি ক্ষতি/বৃদ্ধি হতে পারে। সূক্ষ্মবিচারে দেখা যাবে সমকামিতাও এক ধরনের 'শৃঙ্খলিত বিশৃঙ্খলা'! এর মধ্যেও আধিপত্য-কাঠামো প্রসারিত হয়েছে। সেই আধিপত্য 'গৌণ উপভোক্তার' উপর 'মুখ্য উপভোক্তা'র অবদমন'কে আরোপ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিন্যাস উপনীত হয় আরো একটি 'তন্ত্র'-এ। তাহলে পুরুষতন্ত্রের চরম বিরোধিতা বা চরম সমর্থন আমাদের কোন সামাজিক বা অসামাজিক যৌনতন্ত্র থেকে জারিত কিংবা বিজারিত করছে না। বা আরো সহজভাবে বললে পুরুষতন্ত্রের চরম বিরোধিতা বা চরম সমর্থন কখনোই তথাকথিত নারীমুক্তি বা পুরুষমুক্তি(!)র দরজা খুলে দিচ্ছে না।

তাহলে উপায়? আশা করি কোন 'অতীন্দ্রিয় যৌনবাদ'-এর প্রকল্প পুরুষতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে সোচ্চারে হাজির করা হবে না। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট যে উপায় রইলো তা হলো 'সংস্কার', যে কথা উদারনৈতিক নারীবাদীরা (Liberal Feminists) ইঙ্গিত করে গেছেন। প্রকট লিঙ্গবৈষম্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার উপায় পুরুষতন্ত্রের সংস্কার - চরম নারীবাদীরা (Radical Feminists) হয়তো এই সমাধান'কে 'রক্ষণশীল' বলবেন, কিন্তু অন্তত 'পলায়ন-মনোবৃত্তিসম্পন্ন' বলবেন না, সে আশা পোষণ করা যেতে পারে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সেই লক্ষ্যে প্রয়াসও আরম্ভ হয়েছে কিছুকাল হলো। মহিলা ভোটাধিকার, মহিলা প্রতিনিধিত্ব, মহিলা ক্ষমতায়ন ইত্যাদি সেই সংস্কারেরই দিশায় পরিচালিত। তার বর্তমান বা আগামী দশা সম্পর্কে কোন বিতর্ক উঠলে তা অন্যত্র সেরে নেওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি উল্লেখ্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও Women Space যে একেবারেই অবলুপ্ত তা তো নয়, 'মেয়েলি আড্ডা' বা 'প্রমিলা মহল'-এর রস ও রহস্য সন্ধানে কত পুরুষ রসিককে সাহিত্যে ও শিল্পে 'নারী মন ও মনন মছন' করতে দেখা গেছে, সেও নেহাত অল্পস্বল্প নয়।^৯

‘পুরুষতন্ত্র’-এর সংস্কারের প্রেক্ষিত: তাহলে এ কথা সিদ্ধ যে, পুরুষতন্ত্রের সংস্কারের অবকাশ রয়েছে। এটি বাস্তবে ততটা দুশ্চারিবর্তনীয় নয়, তাত্ত্বিক পরিসরে যতটা চিত্রায়িত করা হয়েছে। কিন্তু যেটা আশু প্রয়োজন তা হলো পুরুষতন্ত্রের সার্বিক সংস্কার। অর্থাৎ ব্যক্তিগত পুরুষতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে সামাজিক পুরুষতন্ত্র, সাংস্কৃতিক পুরুষতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় পুরুষতন্ত্র তথা আন্তর্জাতিক পুরুষতন্ত্রের সংস্কার (অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসী আচরণ, ভোগবাদী সম্প্রসারণবাদী মানসিকতা ইত্যাদির পরিবর্তন প্রয়োজন)। শেষোক্ত চার ধরনের পুরুষতন্ত্রের সংস্কারের জন্য দরকার সংগঠিত প্রয়াস এবং সুগঠিত তত্ত্বায়ন। কিন্তু ব্যক্তিগত পুরুষতন্ত্রের সংস্কার একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। কারণ ব্যক্তিগত পুরুষতন্ত্র কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রবিশিষ্ট নির্মাণ নয়। তার সত্তা দ্বিবিধ, যথা 'সচেতন পুরুষতন্ত্র' ও 'অবচেতন পুরুষতন্ত্র'। 'সচেতন পুরুষতন্ত্র' একধরনের আয়োজিত প্রকল্প, তা অধিকারী ব্যক্তির রুচি, শিক্ষা, সমাজবোধ দ্বারা গঠিত ও সীমিত অন্যদিকে 'অবচেতন পুরুষতন্ত্র'-এর উদ্ভব হয় ঐতিহ্যের প্রতি যুক্তির ছাঁকনিবিহীন আনুগত্য থেকে। তাই ব্যক্তিগত পুরুষতন্ত্রের সংস্কার কোন কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে পুরুষতন্ত্র কিন্তু একাধারে 'লিঙ্গ নির্বিশেষ' ও 'লিঙ্গ সর্বিশেষ' ধারণা। 'লিঙ্গ নির্বিশেষ' ধারণা বলতে বোঝানো হয়, পুরুষ বা নারী যে কোনো ব্যক্তিই পুরুষতন্ত্রের 'চরিত্র' হয়ে উঠতে পারেন।

যদি পুরুষতন্ত্রকে একটি পীড়নমূলক, অবদমনমূলক ব্যবস্থা বলে ধরে নিতে হয়, তাহলে তার বিপরীত পীড়িত সত্তাটি অবশ্যই এবং একান্তই 'নারী' (তার জৈবিক লিঙ্গগত পরিচয় যাইই হোক), একজন পুরুষের দ্বারা অপর পীড়িত ও অবদমিত পুরুষ'ও এক্ষেত্রে নারীসত্তা অর্জন করে। একইরকমভাবে একজন উৎপীড়ক নারীর দ্বারা পীড়িত ও অবদমিত ব্যক্তিটি নারী হলে এক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে উৎপীড়ক নারীকে পুরুষসত্তা সম্পন্ন বলেই গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্র কথাটি লিঙ্গনির্বিশেষ হয়ে পড়ে। যেমন যে শাশুড়ি পণের জন্য বা অন্য কোন কারণে নিজের পুত্রবধূর ওপর পীড়ণমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তিনিও পুরুষতন্ত্রের শরিক। আবার পক্ষান্তরে পুরুষতন্ত্রকে 'লিঙ্গ-সবিশেষ' বলার অর্থ হলো পুরুষ প্রজাতি স্বয়ংক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারী প্রজাতির প্রতি অবদমনমূলক ও পীড়ণমূলক ভূমিকা পালন করবে এমন ধারণা পোষণ করা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পুরুষ প্রজাতি সমপ্রজাতির কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল কিন্তু অপর প্রজাতির ক্ষেত্রে অবদমনমূলক, আবার একইরকমভাবে নারীরাও সমপ্রজাতিতে সহানুভূতিশীল আচরণ করলেও পুরুষ প্রজাতির ক্ষেত্রে বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করবে।^{১০} পুরুষ ও নারীর সামাজিক ধারণার দ্বিবিভাজনের (Binary) ভিত্তিতে এই ধারণা বৈষম্য, ন্যায়, সুবিধা, স্বীকৃতি ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা সন্ধানের চেষ্টা করে।

তাই পুরুষতন্ত্রকে সংস্কার করবার কথা বলা হলে তাকে উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করা উচিত অর্থাৎ উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকেই সেই সংস্কারকে পরিচালনা করা উচিত, যাতে পুরুষতন্ত্র 'সার্বজনীন বৈষম্যের' বদলে এমন ধরনের কিছু গ্রহণযোগ্য বৈষম্য তৈরি করতে সক্ষম হয়, যে বৈষম্যের উপযোগিতার দিকটি বৃহত্তর অংশের জনমন্ডলীর জন্য হিতসাধন সুনিশ্চিত করবে। কারণ কোন তন্ত্রই বৈষম্যমুক্ত হতে পারে না।

তথ্যসূত্র:

- ১। আখতার, ফরিদা ও মজহার, ফরহাদ; পুরুষতন্ত্র ও নারী; আদর্শ প্রকাশনী; ঢাকা (বাংলাদেশ); ২০২২।
- ২। দে, রাখকৃষ্ণ; প্রসঙ্গ : পিতৃতন্ত্র; নারীবিশ্ব; গাংচিল প্রকাশনী; কলকাতা; ২০০২।
- ৩। রহমান, শেখ আতাউর; শাস্ত্র পুরুষতন্ত্র নারী; রোদেলা প্রকাশনী; ঢাকা (বাংলাদেশ); ২০১০।
- ৪। চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম; পিতার হুকুম; প্রথমা প্রকাশণ; ঢাকা (বাংলাদেশ); ২০১৭।
- ৫। মাসুদুজ্জামান; পুরুষতন্ত্র ও যৌনরাজনীতি; পাঞ্জেরী পাবলিকশনস লিমিটেড; ঢাকা (বাংলাদেশ); ২০১৮।
- ৬। ইকবাল, হাসান; ভাষা নারী ও পুরুষপুরাণ; অবসর প্রকাশণা; ঢাকা (বাংলাদেশ); ২০১৬।
- ৭। আখতার, সালমা; পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা; মাওলা ব্রাদার্স; ঢাকা (বাংলাদেশ); ২০১৭।
- ৮। সামস, মুনমুন শারমিন; অল দ্য বেস্ট টু পুরুষতন্ত্র; শ্রাবণ প্রকাশনী; ঢাকা (বাংলাদেশ); ২০১৭।
- ৯। বাগচী, যশোধরা; মাতৃত্ব ও পিতৃতান্ত্রিকতা; নারীবিশ্ব; গাংচিল প্রকাশনী; কলকাতা; ২০০২।
- ১০। ভাসিন, কমলা; পুরুষতন্ত্র কি?; কালি ফর ওমেন; নয়াদিল্লী; ১৯৯৩।